ধারাবাহিক রচনা

কলকাতার ‘রামকৃষ্ণ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান’টি : কিছু সংবাদ কিছু স্মৃতি

স্বামী বলভদ্রানন্দ

সেটা ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের শুরু। একদিন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী রবীন্দ্রসরোবরের রাস্তায় প্রাতর্ভ্রমণ করছেন, এমন সময় এক ভক্তমহিলা তাঁকে প্রণাম করে খুব মিনতির সুরে বললেন, ‘‘মহারাজ, আমরা ঠাকুরের জায়গায় ঠাকুরের কথামৃত একটু শুনতে পাব না?’’ তখন গোলপার্কে ভাগবত, মহাভারত ধারাবাহিকভাবে পাঠ হত, কিন্তু কথামৃত-পাঠ হত না। ওই ভদ্রমহিলার কথা শুনেই মহারাজ কথামৃত ক্লাস শুরু করেন প্রতি বুধবার, ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে।

এছাড়াও বছর খানেকের মধ্যেই মহারাজ প্রতি শুক্রবার ইংরেজিতে উপনিষদ ক্লাস নিতে শুরু করেছিলেন। আরও পরে এরই সঙ্গে মঙ্গলবারগুলিতে নিতেন এক সপ্তাহে গীতা, পরের সপ্তাহে লীলাপ্রসঙ্গ। জীবনের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি এই পাঠগুলি করে গেছেন। শেষ দু-এক বছর তিনি শুক্রবারগুলিতে উপনিষদের বদলে ‘ব্রহ্মসূত্র’ পাঠ করতেন।

মহারাজের কথামৃত ক্লাস অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। আমি যখন প্রথম এসেছি তখন দেখতাম, বিবেকানন্দ হল ভর্তি হয়ে হলের বাইরের তিনটি বারান্দাতেও সতরঞ্চি পেতে দিতে হত। মাইকের কানেকশন দেওয়া ছিল বলে সবাই শুনতে পেত। কোনও কোনও দিন তাতেও কুলোত না। শিবানন্দ হলেও তখন বিবেকানন্দ হলের সঙ্গে মাইক কানেকশন ছিল—সেই মাইকও অন করে দিতে হত, লোকে সেখানে বসে শুনত। এই যে বিবেকানন্দ হলের সঙ্গে বারান্দাগুলির এবং শিবানন্দ হলের মাইক সংযোগ—এগুলি রঙ্গনাথানন্দজীর সময় করতে হয়েছিল, কারণ তাঁর ভাষণ শোনার জন্যও লোক উপচে পড়ত। উল্লেখ্য, বিবেকানন্দ হলের আসনসংখ্যা এক হাজার এক এবং শিবানন্দ হলের আসনসংখ্যা তখন আড়াইশোর মতো। একবার লোকমুখে মহারাজের কথামৃত ক্লাসের সুখ্যাতি শুনে উত্তমকুমার গোপনে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক অতিথিনিবাসে এক রাত ছিলেন ক্লাস শোনার জন্য। পরে উনি একজনকে বলেছিলেন (তিনি আবার আমাদের বলেছিলেন), ‘‘বাজারে যে চিনির কেন এত অভাব, বুঝতে পারছি।’’ অর্থাৎ এতই মধুর লেগেছে কথামৃতের ক্লাস!

আমি ইনস্টিটিউটে ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগ দিয়েছি কোনও এক বৃহস্পতিবার আর ঠিক পরের সোমবার থেকেই পূজনীয় মহারাজ আমাকে প্রকাশনা বিভাগের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সাতাশ বছর সেই কাজই করেছি। তখন 'কালচারাল হেরিটেজ অব ইন্ডিয়া'র পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের কাজ জোরকদমে চলছে। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থমালাকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে চার খণ্ডে প্রকাশ করা হয়ে গিয়েছিল আগেই। কিন্তু প্রতিষ্ঠানে অশান্তি চলায় বাকি চার খণ্ডের কাজ আর এগোয়নি। লোকেশ্বরানন্দজী ১৯৭৪-এর জুন মাস থেকেই পঞ্চম খণ্ডটির কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন, যদিও কর্মী-আন্দোলন তখন তুঙ্গে। তিনি পঞ্চম আর ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ করে দিয়ে যান। তাঁর পরে প্রভানন্দজী সম্পাদক হয়েছিলেন ১৯৯৯-র ফেব্রুয়ারিতে। তিনি দায়িত্ব নিয়েই বাকি দুটি খণ্ডের কাজ শুরু করে দেন। সে-দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ২০১১ এবং ২০১৩ সালে, স্বামী সর্বভূতানন্দজীর সময়ে।

আমার যখন প্রকাশনা বিভাগে হাতেখড়ি হল, তখন ইনস্টিটিউটে বাংলা প্রকাশনা সদ্য শুরু হয়েছে। একটিমাত্র বই বেরিয়েছে : 'ছোটদের সারদাদেবী'। আর একটি বইয়ের কাজ সবে শুরু হয়েছে—'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' এবং শুধু একটা লেখাই তখনও পর্যন্ত এসেছে—সোমেশ্বরানন্দজীর 'নতুন পৃথিবীর সন্ধানে : মার্কস ও বিবেকানন্দ।' এদিকে লোকেশ্বরানন্দজীর কথামৃত ক্লাসের জনপ্রিয়তা দেখে সবাই এটিকে বইয়ের আকারে প্রকাশ করতে বলছিল। আমি নতুন আসাতে আমার উপর ভার পড়ল, মহারাজের কথামৃত ক্লাসগুলি মহারাজের টেপরেকর্ডেড কপি থেকে লিখে ফেলার। আমি সেদিন থেকে শুরু করে সন্ন্যাসের আগে পর্যন্ত এই কাজটি করেছি। সেগুলির উপর ভিত্তি করেই 'তব কথামৃতম্' বইটির সৃষ্টি। লেখার সময় আমি ইয়ারফোন লাগিয়ে টেপরেকর্ডারের কথাগুলি শুনতাম বলে একজন সিনিয়র ব্রহ্মচারী আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, ''মহারাজের সব কথা দেখছি তোর কান দিয়ে ঢুকে হাত দিয়ে বেরিয়ে গেল।'' এই 'কান দিয়ে ঢুকে হাত দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া'র অমোঘ সুফল আমি সর্বদা অনুভব করি।

'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৭-এর জুন মাসে। বইটি প্রথম প্রকাশেই বিশেষ সাড়া ফেলে—কারণ, স্বামীজীর বহুমুখী চিন্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা একখণ্ডের এরকম বই তখন আর ছিল না। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর এবং শঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত 'বিশ্ববিবেক'কে অবশ্য 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দে'র সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু বইটি স্বামীজীর জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত হয়ে কুড়ি বছরেরও বেশি অমুদ্রিত হয়ে পড়েছিল। তাই শঙ্করীপ্রসাদ বসুর পরামর্শে তিন সম্পাদক ও প্রকাশকের অনুমোদন নিয়ে আমরা 'বিশ্ববিবেকে'র প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলি 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দে'র অন্তর্ভুক্ত করে নিই এবং সেগুলি সহ বইটির পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ বের হয় ১৯৮৮-র অক্টোবর মাসে। এখনও পর্যন্ত ওই সংস্করণের পুনর্মুদ্রিত রূপই বাজারে চালু। এটি মুদ্রিত আকারে বের হওয়ার আগেই আমরা 'শতরূপে সারদা'র কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। মায়ের বইটির এই কাজে আমরা সব সাধু ও কর্মীরা খুব আনন্দ পেতাম। মাকে নিয়েও এরকম কোনও সংকলনগ্রন্থ এর আগে ছিল না।

'শতরূপে সারদা' নিয়ে কয়েকটি ঘটনা লিখছি। বই তখন প্রকাশের মুখে, শুধু মহারাজের ভূমিকাটি বাকি আছে। মহালয়ার দিন বইটি বের হবে, মাস খানেকও বাকি নেই। আর DTP তখনও আসেনি, লাইনো টাইপের যুগ। কাজেই আমরা প্রচণ্ড ব্যস্ত।

এর মধ্যে একদিন বিকেলবেলা মহারাজ আমাকে সাধুনিবাসে তাঁর থাকবার ঘরে ডাকলেন। গিয়ে দেখলাম, আনন্দের সংবাদ—মহারাজ তাঁর ভূমিকাটি লিখে ফেলেছেন। মহারাজের কাছ থেকে লেখাটি নিয়ে অফিসে ফিরছি এবং আগ্রহের আতিশয্যে যেতে যেতেই পড়ছি। পড়ে মনে হল, একটি কথা তাতে বাদ গেছে। সেটি আমার মনের কথা, এবং মহারাজের মুখে বারবার শুনতে শুনতেই সেটি আমার মনের কথা হয়ে উঠেছে। ততক্ষণে গ্রাউন্ড ফ্লোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গেছি অফিসের দিকে। এমন সময় সাউথ গেট থেকে দারোয়ান ছুটে এসে বলল, ''মহারাজ আপনাকে ডাকছেন।'' আমি আবার ছুটতে ছুটতে চারতলায় মহারাজের ঘরে গেলাম (তখন আমি চৈতন্যাখ্য ব্রহ্মচারী)। ঢুকতেই মহারাজ বললেন, ''একটা কথা লিখতে ভুলে গেছি।'' আমি বললাম, ''মা স্বমহিমায় মহিমান্বিত?'' মহারাজ খুব মিষ্টি স্বরে বললেন, ''তুমি কী করে জানলে? আমার একেবারে মনের কথাটা তুমি কী করে জানলে?'' —''আপনি তো এই কথা আমাদের কতবার বলেছেন!'' মহারাজ ভূমিকা-লেখা কাগজটা নিয়ে এই কথাগুলি যোগ করে দিলেন : ''কারও স্তুতিতে তিনি বড় নন, তাঁর মহিমা স্বোপার্জিত।'' অর্থাৎ ঠাকুর বলেছেন বলেই মা বড় হয়ে যাননি। না বললেও একই রকম বড় থাকতেন, তবে আমরা তা বুঝতে পারতাম কি না সন্দেহ।

'শতরূপে সারদা' প্রকাশের পর বহুলোকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি লিখত বইটির সম্পাদক লোকেশ্বরানন্দজীকে। মা কীভাবে সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদয়ের ভালবাসা নিয়ে বসে আছেন, প্রতিটা চিঠির সঙ্গে আর একবার করে উপলব্ধি করতাম। এইসব চিঠির মধ্যে উত্তরবঙ্গ থেকে লেখা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের চিঠি এখনও স্মরণে আছে। উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও প্রশংসা প্রকাশ করার পর তিনি লিখেছিলেন, ''আমার জীবন মায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অল্পবয়সে কয়েকবার মাকে স্বপ্ন দেখেছি। এই এতদিনের জীবনে তো হাজার হাজার স্বপ্ন দেখেছি—কোনওটা মনে নেই। কিন্তু মা ওই যে কয়েকবার স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, সেগুলি এখনও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে, যা বলেছিলেন সব মনে আছে এবং সেগুলি সব আমার জীবনে সত্য হয়েছে।'' তিনি কয়েকবছর পর ইনস্টিটিউটে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মহারাজ তখন অসুস্থ থাকলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

আর একটি ঘটনা বইমেলার। ইনস্টিটিউটের স্টলের মাঝখানে বাচ্চাদের উপযুক্ত উচ্চতার একটা বড় টেবিলে ছোটদের বইগুলি সাজিয়ে রাখা থাকত; আর মাঝে মাঝে 'শতরূপে সারদা', 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' আর 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' এই বই তিনটির কয়েকটি কপি দাঁড় করিয়ে রাখা থাকত। একদিন সন্ধ্যের পর ভিড় একটু পাতলা—আমি আমাদের স্টলের ঠিক বাইরে গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। চোখে পড়ছিল : একটি বছর পাঁচেকের বাচ্চা ছেলে লাফাতে লাফাতে আসছে, আর তার পেছনেই তার মা আসছেন। মা কোনও স্টলে ঢুকছিলেন না, স্টলগুলির পাশ দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। আমাদের স্টলেও হয়তো ঢুকতেন না। কিন্তু আমাদের স্টলের কাছে এসেই ছেলেটি, ''মা, দেখো দেখো—সীতা, সীতা'' বলে ঢুকে পড়ে এবং 'শতরূপে সারদা'র প্রচ্ছদে মায়ের ছবিটি দেখিয়ে বলতে থাকে : ''মা দেখো, সীতা।'' মা অবশ্য বলে দেন, ''না বাবা, সীতা নয়, সারদা দেবী।'' কিন্তু আমি অবাক হলাম, ছেলেটি কেন মাকে সীতা বলে ভাবল? কোথা থেকে সে পেল ওই বিষ্ণুপুর স্টেশনের পশ্চিমা কুলির মতো সত্যদৃষ্টি?

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ

জুড়ে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় কনভেনশন। প্রথম কনভেনশন হয়েছিল ১৯২৬-এ। লোকেশ্বরানন্দজীকে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ এই কনভেনশনের সেক্রেটারি করেছিলেন, আমরা ইনস্টিটিউটের সাধু-ব্রহ্মচারী কর্মীরা এই উপলক্ষ্যে অনেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। দশ হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে সপ্তাহব্যাপী সে এক অদ্ভুত অনুষ্ঠান। বেশ সাড়া ফেলেছিল এই কনভেনশন। সাধু ও ভক্তদের মধ্যেও বিশেষ উদ্দীপনা জেগেছিল, ঠাকুরের সক্রিয় মহিমা আবার উপলব্ধি করে।

কনভেনশন শেষ হওয়ার কিছুদিন পর (১৯৮১-র শুরুতে) লোকেশ্বরানন্দজীকে একবার ডেকে পাঠালেন প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী। বললেন, ''তুমি অল্প পয়সায় ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ওপর ছোট ছোট বই বের করো ও প্রচার করো।'' গোলপার্ক থেকে এরপর সেজন্যই প্রকাশিত হয় 'আমার ভারত অমর ভারত' পুস্তকটি। এই কারণেই লোকেশ্বরানন্দজী বইটি উৎসর্গ করেছিলেন পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজীকে। এরপরে এই ধারাতেই প্রকাশিত হয়েছে : সবার স্বামীজী, বিশ্ববরেণ্য শ্রীরামকৃষ্ণ, আমি মা সকলের মা, ভারতের নিবেদিতা প্রভৃতি পুস্তিকাগুলি। এর অনেকগুলিরই ইংরেজি ও হিন্দি অনুবাদও ইনস্টিটিউট প্রকাশ করেছে। ইনস্টিটিউট যেসব যুবসম্মেলন করে সেখানে যুবপ্রতিনিধিদের এই বইগুলি বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

লোকেশ্বরানন্দজী ইনস্টিটিউট অব কালচারের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই কিছুদিনের মধ্যে যুবকদের বিবেকানন্দ-চর্চায় প্রেরণা দেওয়ার জন্য শুরু করেছিলেন 'বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কল'। ষোলো থেকে তিরিশ বছরের তরুণ-তরুণীরা তাতে যোগ দিতে পারত। পরে প্রভানন্দজী যখন সেক্রেটারি হন, তখন তিনি আরও গভীরে বিবেকানন্দ-চর্চার জন্য এর সঙ্গে যোগ করেন আর একটি পাঠচক্র : 'বিবেকানন্দ অনুশীলন'। ১৯৮১-র মাঝামাঝি সময় থেকে ইনস্টিটিউটের যুববিভাগে আর একটি মাত্রা যোগ হয়। তা হল : নিয়মিতভাবে স্কুল-কলেজে গ্রামে-গঞ্জে স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন করা। এরপর থেকে ছুটির দিনগুলিতে আমি এই যুবসম্মেলনে ব্যস্ত থাকতাম। অন্য সাধুরাও যেতেন—সবাই আলাদা আলাদা জায়গায়। সারা বছরে আড়াইশোর মতো সম্মেলন হত ২০০৫ নাগাদ। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার গ্রামে-গঞ্জে শহরে আমরা যেতাম। দুপুরের প্রসাদের আগে পর্যন্ত স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা হত। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর প্রশ্নোত্তরের আসর। শেষ করা হত সমবেত কণ্ঠে এই গানটি গেয়ে—''স্বামীজীর মন্ত্র মোরা ভুলব না, স্বামীজীর স্বপ্ন মোরা ভুলব না...।'' একবার আমি গেছি মেদিনীপুর জেলার মাওবাদী অধ্যুষিত একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। ভাঙাচোরা একটি স্কুলবাড়িতে সম্মেলন হচ্ছে। প্রশ্নোত্তরের আসরটাকে আমি সব জায়গাতেই নিজের মতন করে একটু পালটে নিতাম। এখানেও আমি মধ্যাহ্নভোজনের বিরতির আগে মাইকে বলে দিলাম : ''দেখো, প্রশ্নোত্তর মানে তোমরাই শুধু প্রশ্ন করবে, আমি উত্তর দেব, তা নয়। আমিও প্রশ্ন করব, তোমরা উত্তর লিখে নাম সহ জমা দেবে। আমার প্রশ্ন এই : স্বামীজীর কোন ভাবটা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে এবং সেই ভাব অবলম্বনে তুমি কী কাজ করতে চাও?'' খুব সুন্দর সুন্দর উত্তর পেতাম। যে-প্রত্যন্ত গ্রামটির কথা বললাম, সেখানকার একটি যুবকের উত্তর আমার খুব ভাল লেগেছিল। অস্পষ্ট বাংলায় সে লিখেছিল : স্বামীজী যখন ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে পারবেন না বুঝে বস্টন চলে গেলেন, সেই সময়কার ভাবটা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না, তারপর ছেলেটি বুঝিয়ে দিল।

বস্টনে যাওয়ার পর স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন : ধর্মমহাসভায় যোগদানের সব পথ বন্ধ। কিন্তু আমি এখানে মেরিপুত্রের পুত্রদের মধ্যে আছি (অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের ভক্তদের মধ্যে আছি), প্রভু যিশুই আমাকে পথ দেখাবেন। আমি প্রথমে বস্টনে চেষ্টা করব ভারতের আধ্যাত্মিকতা প্রচার করতে। সেখানে সফল না হলে ইংল্যান্ডে যাব। সেখানে সফল না হলে দেশে ফিরে প্রভুর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করব। চারপাশে যখন সবদিক অন্ধকার, তখনও যে স্বামীজীর এই হার-না-মানা মনোভাব, এটিই ওই যুবকটির মনে সবথেকে দাগ কেটেছে। আমি মুগ্ধ হলাম। ২০০৫ সাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুবসম্প্রদায় সম্পর্কে আমার যা বিশ্বাস জন্মেছে তার নির্যাস এই : স্বামীজী তো যুবকদের অত্যন্ত ভালবাসতেন, আস্থা রাখতেন তাদের ওপর—এই ভালবাসা, আস্থা, বিশ্বাস সবই reciprocal। তাই, অন্তত মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির তরুণ-তরুণীরা স্বামীজীকে তাদের হৃদয় দিয়ে বসে আছে, বেশি কিছু তাঁর সম্বন্ধে না জানলেও। দরকার শুধু স্বামীজীর প্রতি তাদের এই ভালবাসাকে synergise করার, একত্রিত ও সক্রিয় করার।

নিত্যস্বরূপানন্দজী মাঝে মাঝেই দীর্ঘসময় ইনস্টিটিউটে এসে থাকতেন। লোকেশ্বরানন্দজী তাঁর সেবাযত্নের সর্ববিধ ব্যবস্থা করতেন। তাঁর দেহত্যাগও হয়েছে ইনস্টিটিউটেই, ১৯৯২ সালে। নিত্যস্বরূপানন্দজী ভোজনরসিক ছিলেন এবং কোন জিনিসটি কী দিয়ে কীভাবে করলে উৎকৃষ্ট হবে সে-বিষয়ে বিশারদ ছিলেন। আবার পরম রসিকও ছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে এক ব্রহ্মচারীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। যতদূর মনে পড়ে ৯০-৯১ সালে সে ইনস্টিটিউটে এল সঙ্ঘে যোগ দিতে। স্বাস্থ্যবান, সাদাসিধে ধাঁচের। তার কোয়ালিফিকেশন : অঙ্কে এম এস সি আবার বাংলায় অনার্স। সে ভারি মজার ছেলে। একদিন সে কথায় কথায় বলে, সে কোথায় ঘুমের কম্পিটিশনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। ফার্স্টই হত—কিন্তু স্নান-খাওয়া-বাথরুম ইত্যাদির জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় ছিল। পাঁচ দিন ঘুমোনোর পরে সে ভুল করে ওই সময়বিধি ভেঙে ফেলে বলে দুর্ভাগ্যক্রমে সেকেন্ড হয়ে যায়। আমরা খুব মজা পাই এই খবরটি শুনে এবং একদিন খাওয়ার টেবিলে নিত্যস্বরূপানন্দজীকেও বলে দিই, ''মহারাজ, এ ঘুমের কম্পিটিশনে সেকেন্ড হয়েছে।'' মহারাজ খুব উপভোগ করলেন এবং তার মুখ থেকে সেই উদ্ভট প্রতিযোগিতার সব বিবরণ শুনে নিলেন। কিন্তু এতটা নিদ্রা-অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ওই ব্রহ্মচারী কাজকর্মে খুব চটপটে ছিল, আর কলকাতার অলিগলি সে চিনত। আগেই বলেছি নিত্যস্বরূপানন্দজী ভোজনরসিক ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর পছন্দের কিছু কিছু জিনিস খেতে চাইলেন। তার মধ্যে আছে : সাঁতরাগাছির ওল, আমতলার মুড়ি, বড়বাজারের ভাজা মুগডাল, বারুইপুরের মানকচু এবং আরও বেশ কিছু জিনিস—যার অনেকগুলি সম্বন্ধেই আমরা কেউ কিছু ধারণাই করতে পারছিলাম না। ওই ব্রহ্মচারী কিন্তু বলল, ''হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি, এটা ওই জায়গায় পাওয়া যায়, ওটা ওই জায়গায়।'' বেশ বোঝা গেল, এরকম ফর্দ তার কাছে নতুন বা কঠিন কিছু নয় এবং সত্যিই সত্যিই সে একদিন প্রতিটি জিনিস, নিত্যস্বরূপানন্দজী যেমন চেয়েছিলেন, এনে হাজির করল। তারপর মহারাজকে যখন সেগুলি রান্না করে পরিবেশন করা হল, তিনি তখন তৃপ্ত হয়ে মন্তব্য করলেন : ''তোমরা বল ও ঘুমোয়, ও-ই তো সবচেয়ে বেশি জাগ্রত!'' ওই ব্রহ্মচারীকে সাধুদের খাওয়াদাওয়া ও থাকবার ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করতে বলা হয়েছিল অর্থাৎ সাধুনিবাসের 'ভাণ্ডারী' সে। খাওয়াতে সে ভালবাসত। নতুন জীবনে তার বিস্ময়ের শেষ ছিল না। একটা নোটবই থাকত,

আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সম্বন্ধে যা সে শিখত, লিখে নিত। যেমন, প্রসাদ 'খাওয়া' বলা যাবে না, প্রসাদ 'পাওয়া' বলতে হবে; সিনিয়র হলে ফোনে প্রথমেই প্রণাম জানাতে হবে, জুনিয়র হলে কিছু না বললেও চলবে অথবা 'নমস্কার' বলতে হবে কিন্তু 'প্রণাম' বলা চলবে না। বলতেই হবে যে এসব ব্যাপারে সে বেশ প্র্যাকটিক্যাল ও সিনসিয়ার ছিল।

লোকেশ্বরানন্দজীর একটা অভ্যাস ছিল যে তিনি অনেক সময়ই সাধু-ব্রহ্মচারীদের নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় ঠেলে দিতেন। তিনি মনে করতেন, ওইভাবেই ভেতরের শক্তির স্ফুরণ হয়। ১৯৯৩-এর ২৯ ও ৩০ জুন 'বিশ্বভারতী'র সহযোগিতায় 'Swami Vivekananda and National Integration' বিষয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল মূল বিষয়টিকে তিনটি বিষয়ে ভাগ করে বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা করা হবে। বিষয়গুলি হল : i) Swami Vivekananda's concepts of Indian unity ii) Can Practical Vedanta be the basis of building India as one nation? iii) The peripheral problems of National Integrity and their solutions. স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে এই সেমিনারটি আয়োজিত হচ্ছিল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন বক্তা অংশ নেবেন। তার মধ্যে বেশ কিছু সন্ন্যাসীও আছেন যাঁরা দিল্লি, চেন্নাই এবং অন্য প্রদেশ থেকে আসবেন। মহারাজ চাইলেন ইনস্টিটিউটে আমরা যারা অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী তাদের সবাইকে এই সেমিনারে বলতে হবে, মাধ্যম অবশ্যই ইংরেজি। কী আর করব? আমারই বয়স তখন চল্লিশের নিচে। অন্যদের তো আরও কম। ভাণ্ডারী ব্রহ্মচারীই অতিথি সাধুদের থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে। মহারাজ একদিন তাকে ডাকলেন তাঁর নিজের ঘরে, আমি আর একজন ব্রহ্মচারীও তখন সেখানে উপস্থিত আছি। সে এলে মহারাজ বললেন, ''জান তো—সামনে বড় সেমিনার। সব সাধুরা আসবেন নানা জায়গা থেকে...'', মহারাজকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ভাণ্ডারী ব্রহ্মচারী মহারাজকে আশ্বস্ত করার জন্য বলতে থাকে : ''হ্যাঁ মহারাজ, সব ঠিক আছে। ঘরটর সব রেডি করে রেখেছি...।'' এবার মহারাজ তাকে থামিয়ে দেন, বলেন, ''সে তো জানি, ঠিক আছে, ঠিক রাখবেও তুমি। কিন্তু তোমাকে বলতে হবে সেমিনারে। (আমাদের দেখিয়ে) এই তো ইনি বলবেন, ও বলবে, তুমিও দশ মিনিট ইংরেজিতে বলবে, কেমন?'' ব্রহ্মচারীর মুখটা হাঁ-ই থেকে যায়, কিছু কথা বেরোয় না। বেরিয়ে এসেই সে বলে, ''মহারাজের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'' যেহেতু তাকেও এই সেমিনারে বলতে বলেছেন, সেজন্যই তার এই সন্দেহ! ভাণ্ডারী কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেছিল এবং ভালই বলেছিল—দশ মিনিট ইংরেজি ভাষায়, অকুতোভয়ে, মাইক-নিরপেক্ষ উদাত্ত কণ্ঠে—যদিও মাইক অবশ্যই ছিল।

নিত্যস্বরূপানন্দজীর মতো ইনস্টিটিউটের আর-একজন ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী অকুণ্ঠানন্দজীও ১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৭ সালে তাঁর দেহত্যাগ পর্যন্ত টানা চার-পাঁচ বছর ইনস্টিটিউটের সাধুনিবাসে ছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ এই তিন বছর তিনি ইনস্টিটিউট অব কালচারের সেক্রেটারি ছিলেন। অকুণ্ঠানন্দজী পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, আর পূর্বাশ্রম সূত্রে ছিলেন বলরামবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণময়ীর পুত্র। বলরামবাবুর দৌহিত্র হওয়ার জন্য পার্ষদ ও পার্ষদ-পরবর্তী প্রথম যুগের সন্ন্যাসীদের তিনি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁরা তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তিনিও তাঁদের সঙ্গে তাঁর সমবয়স্ক সন্ন্যাসীদের তুলনায় অনেক দ্বিধাহীন ও নিঃশঙ্ক আচরণ করতেন।

বিশেষত নির্বাণানন্দজী ও মাধবানন্দজী তাঁকে আলাদা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। মাধবানন্দজী তাঁর-চেয়ে-বয়সে-ছোট সব সাধুকেই 'তুমি' বলতেন। একমাত্র ব্যতিক্রম অকুণ্ঠানন্দজী—তাঁকে তিনি 'তুই' বলতেন। আর নির্বাণানন্দজী বলতেন, ''শম্ভু আমার গার্জিয়ান।'' 'শম্ভু' অকুণ্ঠানন্দজীর পিতৃদত্ত নাম। 'অকুণ্ঠানন্দ' নামটি তাঁর স্বভাববৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। তাঁর 'অকুণ্ঠ' আচরণের বহু দৃষ্টান্তের একটি এখানে উল্লেখ করছি। মাধবানন্দজী তখন মঠ-মিশনের সম্পাদক। অকুণ্ঠানন্দজীর কোনও কথায় মাধবানন্দজী একদিন সাময়িকভাবে রেগে গিয়ে তাঁকে বলেছেন, ''Get out!'' তাঁর আদেশ মান্য করে অকুণ্ঠানন্দজী অফিসঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভেতরে ঢুকে পড়লেন। মাধবানন্দজী রাগত স্বরে বললেন, ''তোমাকে তো বেরিয়ে যেতে বললাম! আবার এলে যে!'' অকুণ্ঠানন্দজীর উত্তর : ''বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন, ঢুকতে তো বারণ করেননি।'' বলা বাহুল্য, কে-ই বা এমন বেরসিক বা প্রস্তরহৃদয় হবেন যে, এরপরেও তাঁর উপরে রেগে থাকবেন?

সরল, আড়ম্বরহীন, কঠোরী অভ্যাসের এবং আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ কঠোর স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি এবং কাজপাগল ছিলেন। পূর্বাশ্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অঙ্কে এম এস সি করেছিলেন। ধনী পিতা, যিনি রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলীতে 'বিপিন জামাই' নামে পরিচিত, তাঁকে আইন পড়ালেন বিষয়সম্পত্তি ও মামলা-মোকদ্দমা দেখার সুবিধে হবে বলে। কিন্তু অকুণ্ঠানন্দজী বলতেন, বাবার বিষয়বুদ্ধিই তাঁকে বিষয়বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। আইনে স্নাতক হওয়ার পরেই তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। তাই মঠ-মিশনের আইন-সংক্রান্ত কাজগুলি দেখাশোনা করার দায়িত্ব দীর্ঘদিন তাঁরই উপর ছিল। শিকড়া-কুলীনগ্রামে রাজা মহারাজের জন্মভিটার উপর আশ্রম গড়ে উঠেছিল পূজ্যপাদ নির্বাণানন্দজীর তত্ত্বাবধানে। নির্বাণানন্দজীর পর অকুণ্ঠানন্দজীর চেষ্টাতেই সেটি রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়। ট্রেনিং সেন্টারের ব্রহ্মচারী থাকাকালীন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল পূজ্যপাদ নির্বাণানন্দজীর সামান্য সেবা করার। তখন একদিন আমি পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীমুখে অকুণ্ঠানন্দজী সম্পর্কে এই সপ্রশংস উক্তিটি শুনেছিলাম : ''তাঁর এখন ধ্যানজ্ঞান সব ওই শিকড়া-কুলীনগ্রাম আশ্রম। এছাড়া কোনওদিকে তাঁর মন নেই।'' বলরাম মন্দিরও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘভুক্ত হয় তাঁর বিশেষ চেষ্টায়।

অকুণ্ঠানন্দজীর অনেক আচরণ অন্যের কাছে কৌতুককর মনে হত, কিন্তু তিনি কোনওকিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে কাজ করে যেতেন। ইনস্টিটিউটের এক পুরনো কর্মীর কাছে এই ঘটনাটি শুনেছিলাম। সেটি সেই কর্মিবিক্ষোভের কাল। কর্মী ইউনিয়নের কিছু কর্মী এবং বাইরের কিছু রাজনৈতিক কর্মী ইনস্টিটিউটের বাইরে (সম্ভবত গোলপার্কে) সমবেত হয়েছে এবং মাইকের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে নানারকম কটূক্তি করে যাচ্ছে। অকুণ্ঠানন্দজী তাঁর অফিসে তাঁর সামনে ওই কর্মীকে কাগজ-কলম দিয়ে বসিয়ে রেখেছেন। কান খাড়া করে তিনি প্রতিটি কটূক্তি শুনছেন, আর মাঝে মাঝেই ওই কর্মীটিকে বলছেন, ''এটা কী বলল শুনলে তো? এটা নোট করে রাখো।'' অর্থাৎ তিনি তো আইনের লোক, বিপক্ষের কিছু কিছু আপত্তিকর মন্তব্য নোট করে রাখছেন, যাতে ভবিষ্যতে কখনও আইনের সাহায্যে তাদের মোকাবিলা করতে পারেন। পরের ঘটনাটি আমি তাঁর মুখেই শুনেছি। একদিন সকালবেলা শুনলেন, কর্মী ইউনিয়নের সমর্থক রাজনৈতিক দলটি গোলপার্কে একটি বিক্ষোভসভার তোড়জোড় করছে। তিনি সাধারণত একটা খাটো ধুতি ও ফতুয়া পরে থাকতেন, আর পায়ে থাকত টায়ারের চপ্পল। ওই পোশাকেই তিনি

আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে, যে-লোকগুলি প্যান্ডেল বাঁধছিল, তাদের কাছে চলে গেলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের কাছ থেকেই তিনি কর্মী ইউনিয়নের সেদিনের কর্মসূচি মোটামুটি জেনে নিলেন, যাতে প্রয়োজনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন। ওরা কিন্তু বুঝতেই পারেনি যে, তিনিই রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের প্রধান।

লোকেশ্বরানন্দজী এবং অকুণ্ঠানন্দজী পরস্পরকে খুব ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। আগেই বলেছি, অকুণ্ঠানন্দজীর কাজ করার ধরন কারও কারও কাছে কৌতুককর মনে হত। একদিন আমার থেকে বছর দশেকের বড় এক সন্ন্যাসী অকুণ্ঠানন্দজীর সঙ্গে সারাদিন একটি কাজে অংশগ্রহণ করে এসেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা লোকেশ্বরানন্দজীর কাছে বর্ণনা করার সময় অকুণ্ঠানন্দজীর প্রসঙ্গ কয়েকবার কৌতুকের ভঙ্গিতে উল্লেখ করলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখলাম, লোকেশ্বরানন্দজীর মুখে কিন্তু কোনও কৌতুক অনুভবের ইঙ্গিত ফুটে উঠল না। সব বিবরণ শুনে শেষে এই কথাটি তিনি বার দুয়েক বললেন, ''কাজে কী নিষ্ঠা দেখো, কী নিষ্ঠা!''

স্বামী অকুণ্ঠানন্দ

ইনস্টিটিউট অব কালচারে লোকেশ্বরানন্দজী এবং অকুণ্ঠানন্দজী সাধুনিবাসের চারতলাতে একই বারান্দা বরাবর থাকতেন এবং একজনের ঘর থেকে তিনটি ঘর দূরে অপরজনের ঘর ছিল; মাঝে ছিল নিচের তলায় যাওয়ার সিঁড়ির জন্য প্রয়োজনমতো প্যাসেজ। অকুণ্ঠানন্দজীর ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হত বলে লোকেশ্বরানন্দজী প্রায়ই অফিসে যাওয়া-আসার পথে অকুণ্ঠানন্দজীর সঙ্গে দু-একটা কথা বলে যেতেন। কিন্তু লোকেশ্বরানন্দজীর ঘরে অকুণ্ঠানন্দজী খুব কম যেতেন, আমাদের মাধ্যমেই তাঁর কুশল সংবাদ নিতেন। এর কারণ, লোকেশ্বরানন্দজী ইনস্টিটিউটের সম্পাদক এবং বহুজনপরিচিত হওয়ায় সর্বদা কর্মব্যস্ত—এই ব্যাপারটিকে তিনি সবসময় স্মরণে রাখতেন ও মান্য করতেন। তাঁর নিজের কারণে লোকেশ্বরানন্দজীর সময় যাতে একটুও নষ্ট না হয়, তার জন্য তিনি সদাসতর্ক থাকতেন এবং সেটা কতটা তা নিচের দৃষ্টান্তটি থেকে বোঝা যাবে।

একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : ''আচ্ছা, কানাইদা (অর্থাৎ লোকেশ্বরানন্দজী। উভয়ে উভয়কে দাদা বলতেন।) সারাদিনে কোন সময় free mood-এ থাকেন বলো তো? সেই সময় আমি ওঁর কাছে যাব। পাঁচ-সাত মিনিট সময় নেব।'' আমি একটু ভেবে-চিন্তে বললাম, ''রাতের খাওয়া হয়ে গেলে সাধুদের ডাইনিং হলে মহারাজ টিভিতে নিউজ দেখতে যান। কিন্তু মহারাজের খাওয়া শেষ হওয়ার প্রায় পনেরো মিনিট পরে নিউজ শুরু হয়। আমার মনে হয়, ওই সময়টা—আপনি যেমন বললেন—মহারাজ free mood-এ থাকেন।'' তিনি বললেন, ''ঠিক আছে, ওই সময়ই যাব। খেয়ে উঠে মুখ ধুয়ে তিনি যখন নিজের চেয়ারে এসে বসবেন, তখন যেন কানাইদার সেবক ছেলেটি আমাকে খবর দেয়। আর তুমিও কানাইদাকে একটু বলে রেখো।'' আমি বললাম, ''হ্যাঁ মহারাজ, বলে রাখব।'' তারপর বললেন, ''আচ্ছা, আমার ঘর থেকে কানাইদার ঘরে যেতে কতক্ষণ লাগে?'' আমি বললাম, ''এক-দেড় মিনিট।'' তিনি বললেন, ''না, চলো

দেখি।" তাঁর ঘর থেকে রওনা হলেন তাঁর বাঁ হাতটা আমার ডান কাঁধে রেখে। হাঁটার সময় এই সাপোর্টটা তখন ওঁর দরকার হত। লোকেশ্বরানন্দজীর ঘরের দরজা পর্যন্ত যেতে কত সময় লাগে, ঘড়ি দেখে সেটা হিসেব করা হল। তারপর ওঁর ঘরে ফিরে এসে তিনি বললেন, ''বোসো, আমি সেদিন কানাইদার সঙ্গে কী কথা বলব, মন দিয়ে শোনো।" তিনি সবটা আমায় বললেন। তারপর বললেন, ''তোমায় বলে রাখলাম তার কারণ, এখন আর সবসময় সব কথা মনে পড়ে না। কানাইদার সঙ্গে কথা বলার সময় যদি দেখি, আমার কোনও একটা কথা মনে আসছে না, তখন তোমার দিকে তাকিয়ে আমি এরকম একটা ইঙ্গিত করব (ইঙ্গিতটা দেখিয়ে দিলেন)। তুমি তখন খেই ধরিয়ে দেবে।" গোটা ব্যাপারটার বেশ কয়েকবার মহড়া হল; লোকেশ্বরানন্দজীকে তিনি কী কী বলবেন এবং ভুলে গেলে কীভাবে আমাকে ইঙ্গিত করবেন, তারও মহড়া হল কয়েকবার। এইসব সতর্কতা শুধু এইজন্য যে, পাছে তিনি লোকেশ্বরানন্দজীর মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলেন। অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে লোকেশ্বরানন্দজী যখন রাতের খাবার খাচ্ছেন, আমি তখন অকুণ্ঠানন্দজীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম, তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। লোকেশ্বরানন্দজীকেও বলা ছিল। তারপর তাঁর সেবক ছেলেটি এসে খবর দিল, মহারাজের খাওয়া হয়ে গেছে। অকুণ্ঠানন্দজী তখন আমার কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে রওনা হলেন এবং লোকেশ্বরানন্দজীর ঘরে গিয়ে তাঁর জন্য রাখা নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসলেন। উভয়ে প্রায় মিনিট দশেক কথা বললেন এবং সত্যিই দেখলাম, তিনি একবার-দুবার ভুলে গেলেন কী বলবেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন, আর আমিও তাঁকে ধরিয়ে দিলাম কী বলতে হবে—ঠিক যেমন রিহার্সাল দিয়েছিলাম। তারপর তিনি আবার ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

অকুণ্ঠানন্দজী আমাকে তাঁর এই কাহিনিটি শুনিয়েছিলেন : একবার তাঁর পায়ে কোনও একটা কষ্ট হয়েছিল। (কী হয়েছিল সেটা বলেছিলেন, কিন্তু এখন আর আমার মনে পড়ছে না।) ডাক্তার বললেন, পায়ে অপারেশন করতে হবে। তিনি খুব উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন : কী হবে? পা-টা কি বাদই দিতে হবে? বাদ না দিলেও অপারেশনের পরে পা-টা কি আগের মতো সক্ষম থাকবে? এমন সময় তিনি একদিন রাস্তায় দেখলেন, একটি যুবক ছেলের একটা পা-ই নেই, সে কিন্তু মহা আনন্দে আছে বলে মনে হচ্ছে এবং রোয়াকে বসে মাঝে মাঝে একটা পা-ই দোলাচ্ছে। এটি দেখে তাঁর নিজের প্রতি ধিক্কার এল : আমি সাধু, তবুও আমি এত চিন্তা করছি! এই ছেলেটি তো সাধু হয়নি, কিন্তু এর তো কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই যে, একটা পা নেই! তিনি দৃঢ়সংকল্প করলেন, আর পায়ের সমস্যা নিয়ে ভাববেন না। সত্যিই ভাবেননি। সৌভাগ্যক্রমে অপারেশন ছাড়াই তাঁর পা ভাল হয়ে গিয়েছিল।

তিনি বক্তৃতা, পাঠ প্রভৃতি করার ব্যাপারে কখনও আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু পূজ্যপাদ মাধবানন্দজীর জন্মশতবর্ষে ইনস্টিটিউটের বিবেকানন্দ হলে মাধবানন্দজী সম্বন্ধে একটি অসাধারণ স্মৃতিচারণা করেছিলেন। সেদিন যা শুনেছিলাম তা থেকে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

মঠের খুব জরুরি একটি কাজে সেদিন মাধবানন্দজী তাঁকে সিউড়ি রওনা হতে বলছেন। শুধু বলেনইনি, টিকেটও কেটে রেখেছেন। অথচ সেদিনই মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজা। অকুণ্ঠানন্দজী বিনীতভাবে বললেন, যদি পরদিন ভোরে রওনা হওয়া যায়! তাহলেও তো কাজ হয়ে যাবে। মাধবানন্দজী গম্ভীরভাবে বললেন, ''ও, বেলুড় মঠে উৎসব দেখাটা ঠাকুরের পূজা; কিন্তু সিউড়ি যাওয়াটা ঠাকুরের পূজা নয়—এই তো?"

অকুণ্ঠানন্দজী আর দ্বিধা করেননি সিউড়ি রওনা হতে। এরপর তিনি সারাজীবন এই শিক্ষা, এই ভাব নিয়েই নিজেকে সঙ্ঘের কাজে বিভোর রেখেছিলেন। অল্পসময়ের জন্য তদানীন্তন রেঙ্গুন কেন্দ্র এবং ইনস্টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষতা ছাড়া কখনও কোনও কেন্দ্রে কোনও পদ তিনি গ্রহণ করেননি, কিন্তু সবসময়ই বিভিন্ন কেন্দ্রের আইন সংক্রান্ত কাজে তিনি ব্যস্ত থেকেছেন। এই কাজের সূত্রে তিনি প্রধানত বলরাম মন্দির ও সেবাপ্রতিষ্ঠানেই বেশি থাকতেন, শেষ কয়েকবছর ইনস্টিটিউট অব কালচারে ছিলেন। অত্যন্ত কঠোরী ও কাজপাগল ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা অনেক সময় সাধুদের পক্ষে দুষ্কর হত। আমার সমসাময়িক এক সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী-অবস্থায় কয়েকবছর তাঁর সেবক ও সহকারী ছিলেন। অকুণ্ঠানন্দজীর খুব স্নেহের পাত্র ছিলেন তিনি, কিন্তু তা বলে তাঁর বকুনি কিছু কম খেতেন না। তাঁর বকাবকি খেয়ে একবার তিনি ভাবলেন, ইনি যখন আমার কাজে সন্তুষ্ট হচ্ছেন না, তাহলে অন্য কোনও কেন্দ্রে চলে যাওয়াই ভাল। ওই কথা তিনি অকুণ্ঠানন্দজীকে নিবেদন করলেন। আমার ওই বন্ধু-সাধুটির কাছে শুনেছি : অকুণ্ঠানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে গহনানন্দজীকে ফোন করেন, বলেন, ''দেখো, তোমার চেলাটি আর আমার কাছে থাকতে চাচ্ছে না, চলে যাবে বলছে।''

'চেলা' বলার কারণ গহনানন্দজী তখন মঠ-মিশনের সহ সম্পাদক এবং তাঁদের নির্দেশেই ওই সাধুটি তাঁর সেবক-সহকারী হন। গহনানন্দজী অকুণ্ঠানন্দজীকে বললেন ফোনটা ওই সাধুকে দিতে এবং সাধুটিকে বললেন, ''এমন ভুল কোরো না! কোথায় পাবে ওঁর মতো সাধু, ওরকম ত্যাগ-বৈরাগ্য? কত ধনী পরিবারের ছেলে, কিন্তু একটা ফতুয়া পরে সারাজীবন কাটিয়ে দিলেন। যতদিন পার সঙ্গে থেকে জীবনটা তৈরি করে নাও।'' বলা বাহুল্য, আমার বন্ধু-সাধুটি ওই ভুল আর করেননি। যতদিন বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করেছেন, ততদিনই তিনি মহারাজের সঙ্গে খুশিমনে ছিলেন। ইনস্টিটিউটে থাকাকালীন ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি অকুণ্ঠানন্দজীর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়, পরদিন সেবাপ্রতিষ্ঠানে তাঁর দেহান্ত হয়।

ইনস্টিটিউটে ছিলাম বলেই দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজীরও সামান্য কিছু সঙ্গ করতে পেরেছি। কারণ, পূজ্যপাদ মহারাজ যখন কোনও কারণে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতেন, ডাক্তাররা ডিসচার্জ করার পর তাঁকে কিছুদিন গোলপার্কে রাখতে চাইতেন, তারপর বেলুড় মঠে ফেরা অনুমোদন করতেন। এটা এই কারণে যে, হঠাৎ যদি মহারাজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কোনও জরুরি প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাঁরা তাড়াতাড়ি এসে মহারাজকে দেখতে পারবেন। অন্তত দুবার এরকম হতে দেখেছি। একবার পূজ্যপাদ মহারাজ আমাদের কাছে আছেন। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বেলুড় মঠ থেকে প্রভানন্দজী এলেন। প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন : ''মহারাজ, ভাল আছেন তো? রাতে ঘুম হয়েছে?'' মহারাজ বললেন, ''না হয়নি।'' প্রভানন্দজী বললেন, ''কেন মহারাজ?'' মহারাজ বললেন, ''রাতে স্বপ্ন দেখছি, একটা গরুর গাড়ির গরু আমাকে গুঁতোতে এসেছে। আমি তার শিংদুটো চেপে ধরেছি। গাড়োয়ানকে বলছি গরুটাকে সামলাও, সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, আমার কথা শুনছে না। এদিকে হাত দুটো ছেড়ে দিলেই গরুটা আমাকে গুঁতিয়ে দেবে। তাই তার শিংদুটো ধরেই থাকলাম সারারাত। আর ঘুম হল না।'' মহারাজের কথা শুনে আমরা হেসে আকুল, কিন্তু তিনি একটুও হাসলেন না, গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলে গেলেন।

ঘুম না হওয়ার ব্যাপারটা কোনও হালকা ব্যাপার নয়, বিশেষত তাঁর মতো বয়সে। কিন্তু নিজের

শরীরের ব্যাপার বলে সেটাকে হালকা করে দিলেন। অথচ এইসময়ই দেখেছি আর একটি চিত্র। আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট এক সন্ন্যাসী তাঁকে প্রণাম করতে ইনস্টিটিউটে এসেছে। সে মহারাজের কাছেই যোগোদ্যানে ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগদান করেছিল। তখন কলকাতার উপকণ্ঠে একটা শাখাকেন্দ্রে থাকে। সেখান থেকে কাজের সূত্রে প্রতিদিন তাকে কলকাতায় আসতে হয়। ঠিক থাকে না কখন খাবে, কোথায় খাবে। মহারাজ তার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন সবকিছু। তারপর বারবার আক্ষেপ করতে থাকলেন: ''খাওয়াটা যে তোমার ঠিকমতো ঠিক সময়ে হয় না, এটা আমার ভাল লাগছে না।"

আর একদিন রাতের খাওয়ার পর গেছি মহারাজের কাছে। সেবক ছাড়াও আর একজন সাধু আছেন তাঁর কাছে। মহারাজ বলছেন, ''একদিন এক ভক্ত প্রণাম করতে এসেছে। প্রণাম করে পা আর ছাড়ে না। দেখছি কাঁদছে। আনন্দ হল; ভাবলুম ভগবানের জন্য কাঁদছে। তারপর বলে, ভাড়াটে তুলতে পারছে না; তাই কাঁদছে।" আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। হাসি থামলে, মহারাজ একটা অদ্ভুত মন্তব্য করলেন : ''মাঝে মাঝে ভারি লজ্জা করে।" বলেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমাদের মুখেও কোনও কথা নেই।

একবার মহারাজের কাছে আমি কিছুক্ষণ একা ছিলাম। মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম, ''মহারাজ, শুনেছি, বিয়াট্রিস বলে একজন বিদেশি মহিলা, সারদানন্দজী মহারাজের দীক্ষিতা—উনি নাকি মহারাজকে মা বলে ডাকতেন? আর সারদানন্দজী মহারাজও নাকি যখন তাঁকে পত্র দিতেন, শেষে নিজের নাম না লিখে 'মা' লিখতেন! এটা কি সত্যি?" মহারাজ বললেন, ''হ্যাঁ সত্যি।"

তারপর, একটু হেসে, যেন লজ্জিতভাবে বললেন, ''বলতে নেই, অতটা না হলেও, ওই মাতৃভাব কিন্তু আমার মধ্যেও এসে গেছে।" মহারাজের শরীর যাওয়ার পরে জেনেছি ভক্তদের মধ্যে তো বটেই, আমাদের সাধুদের মধ্যেও অনেকে মহারাজকে 'মা' বলে ডাকতেন!

শেষ করব একজন 'সাধারণ' অসাধারণ সাধুর কথা বলে। লোকেশ্বরানন্দজীরও দুবছর আগে, ১৯৭১ সালে তিনি ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন, ছিলেন প্রায় সাঁইত্রিশ বছর—৮ আগস্ট ২০০৯ তারিখে তাঁর দেহত্যাগ পর্যন্ত। পূজ্যপাদ বিরজানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত ছিলেন তিনি। নাম স্বামী রসজ্ঞানন্দজী। দক্ষিণভারতের মানুষ, কিন্তু ইংরেজিই তাঁর মাতৃভাষা হয়ে গিয়েছিল। নিজের প্রদেশের লোকের সঙ্গেও ইংরেজিতে কথা বলতেন। বাংলা বলতে পারতেন খুব সামান্য, তবে বুঝতে পারতেন ভালই। আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখেছি তখন তিনি ইনস্টিটিউটের 'বুলেটিন'-এর সম্পাদনার কাজ দেখতেন। অফিসে থাকতেন সারাদিনে ঘণ্টা-দুয়েকের মতো। বেশিরভাগ সময় ঘরে বসে জপ করতেন। শেষ পনেরো বছর তিনি আর বুলেটিনের কাজ দেখতেন না। ওই দায়িত্ব অন্য একজনকে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল স্বামীজীর কমপ্লিট ওয়ার্কস। সেটিই তাঁর একমাত্র শাস্ত্র ছিল। কতবার যে পড়েছেন তার ঠিক নেই। তাঁর রুটিনের সঙ্গে আমাদের রুটিন মিলত না। তিনি ব্রেকফার্স্ট করতেন সকাল নটা-দশটার সময়, দুপুরের খাওয়া দুটো-তিনটেতে আর রাতের খাওয়া এগারোটার আগে নয়। এগুলি তাঁর খাওয়া শুরুর সময়। শেষ কখন হবে তা বলা যেত না! খাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে থাকত স্বামীজীর কমপ্লিট ওয়ার্কস-এর একটা খণ্ড, স্টেটসম্যান পত্রিকা এবং একটি অক্সফোর্ড ডিকশনারি। পড়তে পড়তে খেতেন এবং খেতে খেতে পড়তেন বলে তাঁর খাওয়ার 'সেশন'গুলি বেশ দীর্ঘ হত। তাঁর পরিচিত বিশেষ কেউ ছিল না, বিশেষ কেউ তাঁর কাছে

আসতও না—কিন্তু মাঝে মাঝে স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ইনস্টিটিউটের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার সময় কোনও কর্মী বা ভক্ত যদি তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন, তিনি হাসিমুখে কথা বলতেন। তাঁর লেখা বা বক্তৃতার কেউ প্রশংসা করলে তিনি বালকের মতো আনন্দ প্রকাশ করতেন। ইনস্টিটিউট বা মঠ-মিশনের কোথায় কী হচ্ছে তিনি বিশেষ জানতেন না, কারণ তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতেন। আমরাই তাঁকে মাঝে মাঝে উপযাচক হয়ে নানা খবর দিতাম। তাঁকে দেখে মনে হত ভেতরে ভেতরে তিনি আনন্দে আছেন। জপ ও স্বামীজীর রচনাবলির মধ্যেই তিনি সমস্ত আনন্দ পেতেন মনে হয়। বাইরের জগৎটার কোনও আকর্ষণ তাঁর কাছে ছিল না।

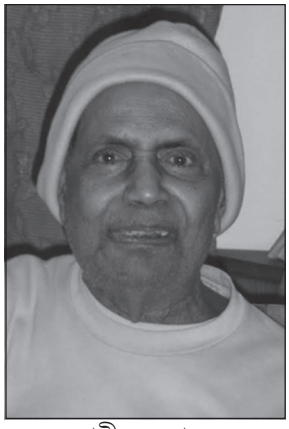
স্বামী রসজ্ঞানন্দ

একবার আমার থেকে প্রায় দশ বছরের বড় এক সন্ন্যাসী কয়েক মাস হল ইনস্টিটিউটে আছেন। থাকার কারণ, তিনি আমেরিকায় সাধু-কর্মী হয়ে যাচ্ছেন, তার প্রস্তুতিপর্বের কিছু কাজ গোলপার্কে থেকে করা সুবিধে। তখন তাঁর ভিসা হয়ে গেছে। আমেরিকায় গিয়ে অনেক সময়ই তাঁকে কোট-প্যান্ট ও টাই পরতে হবে। তাই এক সেট কমপ্লিট সাহেবি পোশাক তাঁর জন্য বানানো হয়েছে। বয়সে বড় হলেও আমাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতো মিশতেন; তাই রাত্রে খাওয়ার পর একদিন আমরা তাঁকে সেসব পরিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছি। হঠাৎ আমার মাথায় কী চপলতা এল, বললাম, ''আপনি ভিজিটার্স রুমে বসে থাকুন, আমি রসজ্ঞানন্দজীকে ডেকে নিয়ে আসি, দেখি উনি আপনাকে চিনতে পারেন কি না?'' রসজ্ঞানন্দজীকে গিয়ে বললাম, ''মহারাজ, এক ভদ্রলোক এখানে আছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই আমেরিকা চলে যাবেন। উনি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবেন—ভিজিটার্স রুমে বসে আছেন।'' উনি গেঞ্জির উপরে জামাটা চড়িয়ে এলেন। উনি কিন্তু মোটেও আমেরিকাযাত্রী মহারাজকে চিনতে পারেননি। সরল বিশ্বাসে কথা বলে যাচ্ছেন। হঠাৎ আমেরিকাগামী মহারাজই আর হাসি সামলাতে পারলেন না। আমরাও হেসে ফেললাম। রসজ্ঞানন্দজীকে বললাম, ''মহারাজ, আপনি চিনতে পারলেন না? ইনি আমাদের অমুক মহারাজ। আমেরিকায় যাবেন বলে সাহেবি পোশাকে ট্রায়াল দিচ্ছেন।'' মহারাজও হাসলেন, তারপর আমরা যে যার ঘরে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর আমি আবার ওপরতলায় এলে রসজ্ঞানন্দজীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমায় বললেন, ''শোনো, তোমার এটা করা উচিত হয়নি; ঠাকুর বলেছেন না, ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যে কথা বলতে নেই!'' আমি ভুল স্বীকার করে নিলাম।

আমি অন্য কেন্দ্রে চলে যাই ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে। বেলুড় মঠ থেকে সেই খবর আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইনস্টিটিউটের সব সাধু-ব্রহ্মচারী সেটি জেনে গেছেন। কিন্তু রসজ্ঞানন্দজী কারও সঙ্গে মেশেন না ও ঘরের মধ্যেই বেশিরভাগ সময় থাকেন বলে খবরটা পেয়েছেন এক-দুদিন পরে। যেদিন খবর পেয়েছেন তার পরদিন সকালবেলায় দেখা হতেই আমায় বলছেন, ''তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছ?'' আমি বললাম, ''হ্যাঁ, মহারাজ!'' তিনি বললেন, ''আমি কাল খবরটা শুনলাম। আমি না কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি!'' আমি অবাক! বুঝিনি তো কখনও, ইনি আমাকে এত স্নেহ করেন! শ্রীশ্রীমা কোয়ালপাড়ার অধ্যক্ষ মহারাজকে বলেছিলেন, ''ভালবাসায় তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।'' 'তাঁর সংসার' মানে ঠাকুরের এই সঙ্ঘ।